UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

2010 International Year of Biodiversity

জুলাই-২০১০ July 2010

২২তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা Volume-XXII, No. VII

কর্মশক্তির সবুজায়ন

জলবায়ু নিয়ে আলোচনা তার তীব্র পর্যায়ে প্রবেশ করছে। আলোচকদের লক্ষ্য হলো, এ যাবৎকালের সবচেয়ে জটিল আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারগুলোর একটি প্রস্থ একত্রে উপস্থাপন করা। এই লক্ষ্যে একটি উচ্চাভিলাষী প্যাকেজ যা জলবায়ুর বিপজ্জনক পরিবর্তন রোধে যে সামান্য সময় রয়েছে তার মধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ এনে দেবে। এ ধরনের একটি চুক্তি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাহায্যে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করবে, প্রযুক্তির স্থানান্তর বৃদ্ধি করবে ও শত শত কোটি ডলারের সংস্থান করবে।

কোপেনহেগেনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের চ্যালেঞ্জকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)ভুক্ত নিয়োগকারী, শ্রমিক-কর্মচারী ও সরকারের সমন্বয়ে কর্মবিশ্বের প্রতিনিধিরা অবমূল্যায়ন করছে না। তারা অবগত যে, অর্থবহ জলবায়ু চুক্তিতে উৎপাদন ও ভোগের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও আলোচকদের কাছে তাদের যে বার্তা তা হলো, প্রতিষ্ঠান, চাকরি ও নিয়োগের ধরনে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের জন্য তারা তৈরি রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটকালে চাকরি

গত বছর চাকরি ও অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে মবর্ধমান উদ্বেগের আড়ালে অন্যান্য অগ্রাধিকার ঢাকা পড়ে যায় এবং এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারগুলোর সুদৃঢ় ও সমন্বিত কার্য মের জন্য ধন্যবাদ যে, বাজারের ঘুরে দাঁড়াবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে আয়, চাকরি ও জনগণের ক্ষেত্রে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ৫৩টি দেশে এক জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে, ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বছরে বেকারত্ব বেড়েছে শতকরা ২৩.৬ ভাগ। বিশ্বে বছরে শ্রমশক্তি বাড়ছে সাড়ে ৪ কোটি হারে, সঙ্কট পুর্ববর্তী বেকারত্বের যে পর্যায় ছিল, কেবল সেখানে ফিরে যেতেই এখন থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ৩০ কোটি চাকরির প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সঙ্কটের অভিঘাত আরো বেশি চ্যালেঞ্জপুর্ণ। জাতিসংঘের হিসাবে আরো ৭ কোটি ৩০ লাখ থেকে ১০ কোটি ৩০ লাখ লোক এই সঙ্কটের ফলে দরিদ্র অবস্থায় থাকবে বা দারিদ্র্যে নিপতিত হবে।

কিন্তু অর্থনীতি ও শ্রমবাজারের পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত জলবায়ুর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য অপেক্ষা করার অবকাশ আমাদের নেই। জলবায়ু পরিবর্তন ও চাকরি সঙ্কট দুটিই আমাদের এক সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। বস্তুতপক্ষে জলবায়ু ও চাকরি সঙ্কটের মুল অভিন্ন। আমরা অর্থনীতি, বিশেষ করে আর্থিক খাতের ওপর অতিগুরুত্ব দিয়ে স্থিতিশীলতার

সামাজিক ও পরিবেশের মাত্রাকে অবমুল্যায়ন করেছি। সঙ্কটের প্রতি সাড়া দিতে হলে এই ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটাতে হবে।

বিশ্ব চাকরি চুক্তি

আইএলওর ১৮৩টি দেশের সরকার, নিয়োগকারী ও শ্রমিক সংগঠনগুলো ২০০৯ সালের জুনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতি একটি উৎপাদনমুখী এবং জনকেন্দ্রিক সাড়াদানের কথা উল্লেখ করে বিশ্ব চাকরি চুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তারা একটি বিশ্ব চাকরি চুক্তি গ্রহণ করে। চাকরির পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা, আয়ের পর্যায় ফিরিয়ে আনা এবং প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির সহায়ক একগুচ্ছ ব্যাপক ও সঙ্গাতিপুর্ণ নীতির অংশ হিসেবে চাকরি চুক্তিতে স্বল্পমাত্রার কার্বন ও পরিবেশবান্ধব একটি অর্থনীতিতে স্থানান্তরের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থনৈতিক ও চাকরি সঙ্কটকে স্বল্পমাত্রার কার্বন, উচ্চ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিদুরণমুলক অর্থনীতিতে উত্তরণ জোরদার করার সুযোগে পরিবর্তন করা যেতে পারে। মবর্ধমানসংখ্যক শিল্পোন্নত, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সবুজ উদ্দীপনামুলক ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতি থেকে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যব্যবস্থাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে তা পরস্পরের শক্তিবর্ধক হতে পারে। উন্নয়নের সকল পর্যায়ের দেশগুলোতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস ও জলবায়ুর পরিবর্তন লাঘবে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো নির্মাণ, শিল্প ও পরিবহনে জ্বালানি সাশ্রয়, স্থিতিশীল কৃষি ও বন এবং স্বল্পমাত্রার কার্বন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্থানান্তরের মাধ্যমে লাখ লাখ সবুজ চাকরি সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলো পলকে অবস্থান পরিবর্তন করে সরাসরি পরিষ্কার, একুশ শতকের প্রযুক্তি ও অবকাঠামো গ্রহণ করতে পারে। সবুজ চাকরি ও অধিকতর সবুজ স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠানের অর্জন নির্গমন-ঘন খাতে হারিয়ে যাওয়া বা পরিবর্তিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে যাবে।

> জলবায়ু ও চাকরি সঙ্কটের মুল অভিন্ন। আমরা অর্থনীতি, বিশেষ করে আর্থিক খাতের ওপর অতি গুরুত্ব দিয়ে স্থিতিশীলতার সামাজিক ও পরিবেশের মাত্রাকে অবমুল্যায়ন করেছি। সঙ্কটের প্রতি সাড়া দিতে হলে এই ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটাতে হবে।

এই অন্তর্দৃষ্টির অনুরণন এবং বাস্তব নীতিতে তার রূপায়ণ শুরু হয়েছে। পিটাসবার্গের সম্মেলনে জি-২০ নেতৃবৃন্দ অধিকতর সবুজ, অধিকার স্থিতিশীল ভারসাম্যপুর্ণ বিশ্ব প্রবৃদ্ধির জন্য চাকরিকে পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে সম্মত হয়েছেন।

আইএলও হিসেবে জি-২০ দেশগুলোতে ঐচ্ছিক আর্থিক প্রসার, সে সঙ্গে বেকার সুবিধার মতো স্বয়ং য় স্থিতিস্থাপক ২০০৯ সালে ৭০ লাখ থেকে ১ কোটি ১০ লাখ চাকরি সৃষ্টি বা রক্ষা করবে। এগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হবে সবুজ চাকরি, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ও পরিবেশের অন্যান্য অভিঘাত হ্রাসে সহায়তা করবে।

সঙ্কটে সাড়া দেয়ার জন্য সরকারি নীতির ওপর আইএলওর এক জরিপে দেখা গেছে যে, অনেক দেশ উদাহরণ হিসেবে অবকাঠামো ও জ্বালানি সাশ্রয়ে জোরদার বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সবুজ চাকরির উপাদান অন্তর্ভুক্ত করেছে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে 'গ্রিন নিউ ডিল' প্যাকেজের আওতায় ৩ হাজার ৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে ২০০৯-১০ সালে প্রায় ১০ লাখ সবুজ চাকরি সৃষ্টি করা হচ্ছে বা রক্ষা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সবুজ চাকরির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণদানে ৫০ কোটি ডলার। সকল সবুজ উদ্দীপনামুলক প্যাকেজের মধ্যে চীনের ব্যবস্থা সবচেয়ে বড়, যা আগামী দু'বছরে ৩৭ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি করবে। আরো অনেক দেশের অনেক কিছু করতে হবে, তবে আমরা দেখতে পারি সম্ভাবনা ও চাহিদা।

সবুজ পুনরুদ্ধারে কয়েকটি বৃহৎ বিনিয়োগ কাঠামোগত পরিবর্তনের একটি দীর্ঘতর মেয়াদি কর্মসূচির সূচনা মাত্র। বিশ্বকে সঙ্কট থেকে স্থায়ী পুনরুদ্ধার এবং স্থিতিশীল ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যাপক ও অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যার ফলে সব দেশ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও সবার জন্য সুন্দর কাজ সৃষ্টি করতে দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারবে।

জলবায়ু চুক্তি কার্যকর করা

একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা সব দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন অনুসরণ এবং দেশগুলোর মধ্যে ও অভ্যন্তরের ন্যায্যতা এগিয়ে নেয়া নিশ্চিত করতে পারে। এ ধরনের প্যাকেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে হবে উন্নয়নশীল বিশ্বে স্বল্পমাত্রার কার্বন প্রবৃদ্ধির পথে বিনিয়োগ সহায়তা হিসেবে সম্পদ স্থানান্তর যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত গ্রুপগুলোর জন্য এ ধরনের উদ্যোগ সরাসরি বিনিয়োগ ও সুফল লাভে সহায়ক হতে পারে। যারা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চাপে রয়েছে এবং স্বল্পমাত্রার কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তরের কারণে যাদের চাকরি হারাতে পারে এটা তাদের একটা উত্তরণ ঘটাতে পারে। এসব বিষয় কোনো নতুন সরকারের ন্যায্যতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মিথস্ক্রিয়া স্বয়ং য় নয়। এ উদ্দেশ্যে চাকরি ও আয় সৃষ্টির জন্য স্বল্পমাত্রার কার্বন অর্থনীতিতে উত্তরণ ও সুযোগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি ও সমন্বিত কর্মকৌশলের প্রয়োজন। এনএএমএর (জাতীয়ভাবে লাগসই লাঘব কার্য ম) মতো নীতিগত দলিল এবং এনএপিএর (জাতীয় কার্যক্রম সঙ্গতি বিধান পরিকল্পনা) মতো সঙ্গতি বিধান কর্মকৌশল এবং নতুন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক প্রবাহ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এর প্রতিফলন হতে পারে।

শিল্প ও শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আইএলওর সামাজিক সংলাপের হাতিয়ার উত্তরণের সঙ্গতিপূর্ণ ও কার্যকর নীতি গড়ে তোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। যে বিশ্ব জলবায়ু চুক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে গুরুত্ব বহন করবে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসবে তা এ বিশ্বকে আরো সবুজ, আরো ন্যায়সঙ্গত ও স্থিতিশীল বিশ্ব অর্থনীতির পথে নিয়ে যেতে পারবে।

সবুজ চাকরি উদ্যোগ এবং সবুজ চাকরি সংক্রান্ত আইএলওর বিশ্ব কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মবিশ্ব এ লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় অবদান রাখছে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চুক্তি হবে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র। জলবায়ু চুক্তিকে কার্যকর করতে ফলানুবর্তনের অংশ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে আইএলও।

‘তিনি পথ দেখিয়েছেন। তিনি বিশ্বকে বদলে দিয়েছেন’

বান কি-মুন

১৮ জুলাই ২০১০ প্রথম নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, নেলসন ম্যান্ডেলা শিখর প্রতীক এক সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে রয়েছে মানবতা এবং জাতিসংঘের সর্বোচ্চ গুণাবলি। তাঁর জীবন, শক্তিমত্তা ও তাঁর শিষ্টাচার আমাদের সবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর নিপীড়কদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর লড়াই করেছেন। আর শেষে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে, নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর মহিমা ও মনোহারিতায় আরো অনেকের মতো আমি অভিভূত হয়েছি। কিন্তু আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি তাঁর বিনয়ে। তাঁর জীবনকর্মের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গেলে তিনি জবাবে বলেন যে, ‘এটা আমার প্রাপ্য নয়।’ মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অন্য লোকেরা কী করেছে তা নিয়ে কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন।

> ‘আজকে, প্রথম নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা তাঁকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য তিনি যা করেছেন তার সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাই।’

নেলসন ম্যান্ডেলা লক্ষ-কোটি লোকের জন্য এমন একটা অনুপ্রেরণা কেন এটা তার একটি কারণ মাত্র। তাঁর পেছনে অর্থ বা ক্ষমতার সমর্থন ছিল না। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তিনি অসাধারণ জিনিস অর্জন করেছেন।

নেলসন ম্যান্ডেলার অর্জনগুলোর জন্য তাঁর নিজেকে ও তাঁর পরিবারকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁর ত্যাগ কেবল তাঁর নিজের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ নয় বরং সব জায়গার সব মানুষের জন্য বিশ্বকে একটা উন্নততর স্থানে পরিণত করেছে। আজকে প্রথম নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা তাঁকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য তিনি যা করেছেন তার সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তিনি পথ দেখিয়েছেন। তিনি বিশ্বকে বদলে দিয়েছেন। আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

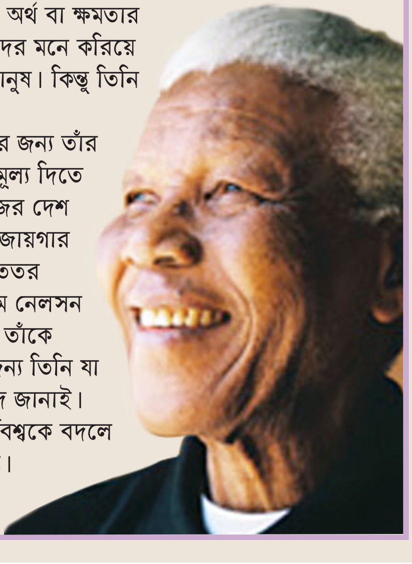

জবাবদিহিতার যুগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য বারো বছর আগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রোমে সমবেত হয়েছিলেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের জন্য ব্যাপক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়ার মতো এমন একটা আঘাত হানা হয়েছে।

এবার উগান্ডার কাম্পালায় ৩১ মে দেশগুলো আবারও একত্রিত হচ্ছে রোম চুক্তির আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার জন্য। কেবল আমাদের অগ্রগতির হিসাব কষা নয় বরং

বান কি-মুন

ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যও এটা একটা সুযোগ। এছাড়া এটা হলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে বিনা শাস্তিতে পার পেতে না দেয়ার আমাদের সম্মিলিত সঙ্কল্পকে জোরদার করার সময়– যা ভবিষ্যতে এসব অপরাধে বাধা দেয়ার চেয়ে উত্তম।

জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে আমি দেখতে এসেছি যে, আইসিসি কতোটা কার্যকর হতে পারে এবং আমরা কতোদুর অগ্রসর হয়েছি। দেশগুলোর ক্রমবিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের হোতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো ও বিচারের জন্য এ আদালত এখন যে পুরোপুরি কার্যকর হতে পারে তা এক যুগ আগে খুব কম লোকেই বিশ্বাস করতে পারতো।

> দন্ডমুক্তির পুরনো যুগ শেষ হয়ে গেছে। সে জায়গায় খুব ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই ‘জবাবদিহিতার এক নতুন যুগের’ জন্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি।
>
> –বান কি-মুন

ইতিহাসের সঙ্গে এটা একটা মৌলিক ছেদ। দন্ডমুক্তির পুরনো যুগ শেষ হয়ে গেছে। সে জায়গায় খুব ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই ‘জবাবাদিহিতকার এক নতুন যুগের’ জন্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি। রুয়ান্ডা ও সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের মধ্য দিয়ে এটা শুরু হয়েছে; আজকে আইসিসি হলো একটি

ক্রমবর্ধমান বিশ্ববিচার ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, যে বিচার ব্যবস্থায় রয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালগুলো, আন্তর্জাতিক-জাতীয় মিশ্র আদালত ও অভ্যন্তরীণ মামলা।

আইসিসি এ পর্যন্ত পাঁচটি তদন্ত শুরু করেছে। দুটি বিচার চলছে, তৃতীয় বিচার জুলাইতে শুরু হওয়ার কথা। চারজন আটকবন্দি হেফাজতে রয়েছে। যারা ভেবেছিল যে এই আদালত একটি ‘কাগুজে বাঘের’ চেয়ে বেশি হবে না, সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বরং আইসিসি ক্রমবর্ধমান হারে একটা দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করছে। যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তারা স্পষ্টই এটাকে ভয় পেতে শুরু করেছে। আর জাতীয় আদালত যেখানে কাজ করে না (করতে পারে না) সেখানে আইসিসি শেষ অবলম্বনের একটা আদালত হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ রোম সংবিধির ১১১তম পক্ষ হয়েছে, আর অপর ৩৭টি দেশ স্বাক্ষর করলেও এখনো অনুমোদন করেনি। অবশ্য বিশ্বের বৃহত্তম ও অত্যন্ত ক্ষমতাধর দেশ এখনো সংবিধিভুক্ত হয়নি।

আইসিসির আওতা থাকতে হলে তার এখতিয়ার থাকতে হবে, আইসিসিকে একটা কার্যকর নিরোধক ও বিচারের পথ হতে হলে তার প্রতি সর্বজনীন সমর্থন থাকতে হবে। মহাসচিব হিসেবে সব দেশের প্রতি আমি যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি। যারা ইতোমধ্যে তা করেছে আদালতের সঙ্গে তাদের পুরোপুরি সহযোগিতা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে এটাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে এর আদেশ পালন করা।

আইসিসির নিজস্ব পুলিশ বাহিনী নেই। এই আদালত গ্রেফতার করতে পারে না। আদালতের পাঁচটি মামলার মধ্যে তিনটির সন্দেহভাজনরাই আবদ্ধ অবস্থায় দন্ডমুক্ত জীবন কাটাচ্ছে। কেবল আইসিসিই নয়, বরং সমগ্র আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা এমন অগ্রাহ্যের শিকার, যা মানবাধিকারের অপব্যবহার যারা করবে তাদের সাহস জোগাবে।

কাম্পালার পর্যালোচনা সম্মেলন আদালতকে জোরদার করার উপায় খুঁজে দেখবে। এর মধ্যে রয়েছে আগ্রাসনের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আওতা বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব এবং যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও মামলা রুজু করার জন্য জাতীয় আদালতের ইচ্ছা ও সামর্থ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

সম্ভবত সবচেয়ে তীব্র বিতর্ক হবে শান্তি ও ন্যায়বিচারের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে। অকপটভাবে বলতে গেলে দুটির মধ্যে আমার কোনো পছন্দ নেই। আজকের সংঘাতে প্রায় ক্ষেত্রেই বেসামরিক লোকজন হয় প্রধান শিকার। নারী, শিশু ও প্রবীণরা থাকে সেনা বা মিলিশিয়াদের করুণায় যারা তাদের ধর্ষণ, বিকলাঙ্গ, হত্যা করে এবং ধ্বংস করে শহর, নগর, গ্রাম, ফসল, গবাদিপশু ও পানির উৎস-যুদ্ধের একটা কৌশল হিসেবে। যে অপরাধ যত বেশি বেদনাদায়ক, অস্ত্র হিসেবে তা তত বেশি কার্যকর।

এ ধরনের অবস্থার শিকার যে কেউ বোধগম্যভাবেই ব্যাকুল হয়ে এমন ত্রাসের অবসান চাইবে। এমনকি যারা অন্যায়-অবিচার করেছে তাদের দন্ডমুক্তি মঞ্জুরের মুল্য হলেও। কিন্তু বন্দুকের নলের মুখে এটা এমন এক অস্ত্রবিরতি যাতে কোনো মর্যাদা, ন্যায়বিচার বা উন্নততর ভবিষ্যতের আশা নেই। শান্তি বনাম ন্যায়বিচার নিয়ে যে সময়ে আমরা হয়তো কথা বলতে পারতাম। সে সময় পেরিয়ে গেছে।

পাশাপাশি দুটিকেই লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করা আমাদের চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত চাবিকাঠি। কাম্পালায় দন্ডমুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এগিয়ে নেয়া এবং জবাবদিহিতার নতুন যুগের সূচনা করতে সহায়তাদানে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হলো ঠিক আমাদের সবার বিরুদ্ধে অপরাধ, যা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

প্রচলিত জ্বালানির প্রকৃত ব্যয়

হেলেনে পেলোসে *

'নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যয়বহুল—এটা ব্যবহারের সামর্থ্য আমাদের নেই।' আমি বহুবার এ ধরনের যুক্তি শুনেছি। কিন্তু যারা এ ধরনের কথা বলে তারা ঠিক নয়। প্রচলিত জ্বালানির চেয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যয় বেশি নয়। বরং লোকে মুল্যের সঙ্গে ব্যয়ের গোলমাল পাকিয়ে ফেলে। তাই তাদের ভালোভাবে অবগত থাকা দরকার যে, প্রচলিত জ্বালানির বাজারমুল্য সত্য কথাটি বলে না।

ব্যয় বনাম মুল্য

সচরাচর ব্যবহৃত জ্বালানি—বিদ্যুৎ ও মোটরযান জ্বালানির মুল্য—আপনার মাসিক বিদ্যুৎ বিলে তালিকাভুক্ত বা গ্যাস স্টেশনে প্রদর্শিত থাকে। এই মুল্য সুবিদিত এবং ভোক্তা ব্যক্তিগতভাবে তা পরিশোধ করে। প্রথম দৃষ্টিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রচলিত জ্বালানির চেয়ে প্রকৃতই বেশি ব্যয়বহুল মনে হয়। জ্বালানি সরবরাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বিষয়টার দিকে তাকিয়ে দেখলে এই ধারণা পাল্টে যায়, যাতে দেখা যায় যে, প্রচলিত জ্বালানির চেয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যয়ের অবস্থান সুবিবেচনাসম্মত। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলকে দূষণ থেকে রক্ষা করে, সম্পদ বাঁচায় ও কম ভূমি ব্যবহার করে। স্পষ্টতই নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনাগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সেগুলো সহজেই পুনর্বিন্যাস ও প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে। অপরদিকে বিশ্বের সমাজগুলো পরমাণু ও কয়লানির্ভর প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে আর্থিক দায়ভার এবং ইউরেনিয়াম ও কয়লা উত্তোলন এবং পারমাণবিক বর্জ্য সংরক্ষণপ্রসূত পরিবেশগত ক্ষতিতে জর্জরিত হচ্ছে।

অধিকাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির চেয়ে জীবাশ্ম ও পারমাণবিক জ্বালানির কার্বন নির্গমন উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের শতকরা ৫০ ভাগই হয় কঠিন নির্গমনের ফলে। জলবায়ু পরিবর্তন লাঘবে যে ব্যয় হবে তার প্রতি স্টার্ন রিভিউ অন দ্য ইকোনমিকস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্প্রতি বৃহত্তর জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, অপরদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ফলে ব্যয় কমে আসে। উদাহরণ হিসেবে বায়ু, পানি, বিদ্যুৎ ও জৈবভর বিদ্যুতের প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় (কে ডব্লু এইচ) গড়ে ৪০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে। অপরদিকে ইউরেনিয়ামনির্ভর একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ৩১ থেকে ১৩০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৮০০ থেকে ১৪০০ গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে।

প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ, জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয় তার প্রতিকারের মতো সংযুক্ত ব্যয়গুলো, উদাহরণ হিসেবে মাসিক বিদ্যুৎ বিলে প্রতিফলিত হয় না। তবু সাধারণ জনগণকে এসব সংযুক্ত ব্যয়ের বোঝা বইতে হয়। আমরা যদি কেবল মুল্যের দিকে তাকাই এবং সংযুক্ত ব্যয়গুলো বিবেচনায় না করে সস্তা ধরনের জ্বালানি পছন্দ করি, তাহলে আমাদের যাত্রা শুরু হবে ভুলপথে। প্রচলিত জ্বালানির মুল্যে উল্লিখিত না থাকলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিবেশগত সত্য তুলে ধরে এবং জ্বালানি সরবরাহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যয়হ্রাস করে।

বাজারের বিশাল ব্যর্থতা

মুল্য বিকৃতির আরো পরিণতি রয়েছে। অনেক দশক ধরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়নে (আরএন্ডডি) কাম সহায়তা, ন্যূনতম ভর্তুকি এবং প্রচলিত জ্বালানির প্রয়োজনে বিন্যস্ত বিশ্ব জ্বালানি কাঠামোর কারণে একটা অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অতীতে প্রচলিত জ্বালানির অর্জিত আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন এবং এখনো তা যে সুবিধা ভোগ করছে তার নিরিখে। প্রচলিত জ্বালানি মুল্যের সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির তুলনা করলে তা সুবিচার করা হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে জনসমর্থনের অভাব থাকলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি বিগত বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান হারে ভালো করেছে। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানির অর্থনীতির মাত্রা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয় কমিয়ে এনেছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে এসব ব্যবস্থার ফলে সৌর বিদ্যুতের শতকরা ৬৮ ভাগ, বায়ুবিদ্যুতে শতকরা ৬০ ভাগ ও সৌরতাপে শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ মোট ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। এই শিল্পের লক্ষ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে আরো শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস, যা হবে আজকের মুল্য আগামীকালের জন্য নয়।

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর জার্মানি ঘোষণা করে যে, এক বছরের মধ্যে সৌর প্যানেলের বিদ্যুতের মুল্য প্রচলিত জ্বালানি উৎসের বিদ্যুতের মুল্যের সমান হবে। অনুরূপ অগ্রগতি স্পেনেও দেখা গেছে। বিগত কয়েক বছরে স্পেনের বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্প্যানিশ এনার্জি এক্সচেঞ্জ ঝড়ো হাওয়ার দিনে বিদ্যুতের সার্বিক মুল্য হ্রাস করে কয়লাচালিত অত্যন্ত 'ব্যয়বহুল' বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে কম মুল্যে বিক্রি করেছে। জার্মানিতেও অনুরূপ ঘটেছে। ২০০৬ সালে ভোক্তাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য ৩শ' ৩০ কোটি ডয়েস মার্ক ব্যয় করতে হয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানির রাজস্ব থেকে যে ৫শ' কোটি ডয়েস মার্ক ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে, উপর্যুক্ত অর্থ ছিল তার অতিরিক্ত। আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির আরেকটা পার্শ্ব-সুবিধা রয়েছে; এগুলো সত্যিকার কর্মসৃজন যন্ত্র। জার্মানিতে বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানিখাতে যত লোক কাজ করছে তা ১৯৯৮ সালের চারগুণ। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে এখানে ২৫ লাখ লোক কাজ করছে।

অবশ্য সৌর প্যানেল ও বায়ু টারবাইনে উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হলেও এগুলো এখনো অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। কারণ বিশ্বের জ্বালানি অবকাঠামো কয়লা, গ্যাস, তেল ও ইউরেনিয়ামের প্রয়োজনভিত্তিক বৈশিষ্ট্য নির্মিত বলে তা প্রচলিত জ্বালানির অনুকূল।

দেশ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্যা স্বীকার করে গবেষণা ও উন্নয়নের মনোযোগ চৌকস গ্রিড অবকাঠামোর প্রতি নিবদ্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গ্রিডে যুক্ত করা, বিভিন্ন নবায়নযোগ্য উৎসের সমন্বয় সাধনে সংরক্ষণ প্রযুক্তি গড়ে তোলা এবং প্রধান গ্রিডের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে যুক্ত করার জন্য গ্রিড সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য একটি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকেন্দ্রিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওঠানামা করা উৎপাদনের সঙ্গতি বিধানের জন্য বিশ্ব জ্বালানি বাজারের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশ্ব জ্বালানি ব্যবস্থা নবায়নযোগ্য জ্বালানির কম ব্যয়ের প্রতি মনোযোগী হলে মুল্য আরো কমে আসবে।

লেখক : ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়াবল
এনার্জি এজেন্সির মহাপরিচালক

প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত

অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট্ট জনবহুল দেশ। একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পিত জনসংখ্যার ওপর। জনসংখ্যাকে সীমিত রাখতে হলে প্রতিটি সক্ষম দম্পতির কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রতিটি দম্পতিকেই পরিকল্পিত পরিবারের আওতায় আনা যায়।

এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এবার ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'। অপরিকল্পিত জনসংখ্যা হ্রাসে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে পুরুষদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের মূল লক্ষ্য।

জনসংখ্যা : বিশ্ব প্রেক্ষাপট

বিশ্বে বর্তমান জনসংখ্যা ৬৮০ কোটি প্রায় (ইউএনএফপিএ-২০১০)। ১৮০৪ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। ১৯২৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০০ কোটিতে। অর্থাৎ ১২৩ বছর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

১৯৭৪ সালে এ জনসংখ্যা আবারও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ কোটি হয়। মাত্র ২৩ বছর আগে ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে পূর্ণ হয় এবং তখন থেকেই প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা ৯০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এ জনসংখ্যার অধিকাংশই বৃদ্ধি পাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকায়। ২০২৫ সালে ভারত হবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ। তখন ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৩৯ কোটি ৬১ লাখে। এ সময় চীনের

জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৩৯ কোটি ৪৭ লাখ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ কোটি ৭৪ লাখ। তালিকায় থাকা শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে অন্য দেশগুলোর অবস্থান হবে– ইন্দোনেশিয়া চতুর্থ স্থান, ব্রাজিল পঞ্চম, পাকিস্তান ষষ্ঠ, নাইজেরিয়া সপ্তম, বাংলাদেশ অষ্টম, ইথিওপিয়া নবম এবং মেক্সিকো দশম স্থানে। বর্তমানে শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে থাকা রাশিয়া ও জাপান ২০২৫ সালে যথাক্রমে ১২ ও ১৫তম স্থানে অবস্থান করবে।

বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির সময়কাল
১৮০৪	১০০ কোটি	
১৯২৭	২০০ কোটি	১২৩ বছর পর
১৯৬০	৩০০ কোটি	৩৩ বছর পর
১৯৭৪	৪০০ কোটি	১৪ বছর পর
১৯৮৭	৫০০ কোটি	১৩ বছর পর
১৯৯৮	৬০০ কোটি	১১ বছর পর
২০১০	৬৮০ কোটি	১২ বছর পর

সূত্র : The World-wide web library : Demography & population studies, UNFPA-2010

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায়, বিশ্বে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময়সীমা মশ কমে আসছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি মিনিটে ২৫০ শিশু জন্ম নেয় এবং ১০৭ শিশুর মৃত্যু হয়। ফলে বছরে গড়ে জনসংখ্যা বাড়ছে ৭ কোটি ৫০ লাখ। বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২, মোট প্রজনন হার ২.৫৪। উন্নত বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৩; মোট প্রজনন হার ১.৬৪। স্বল্পোন্নত বিশ্বে এ হার যথা মে ১.৪ ও ২.৬ এবং অতি স্বল্পোন্নত বিশ্বে এ হার যথাক্রমে ২.৩ ও ৪.১।

জনসংখ্যা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। দেশটি ৭টি প্রশাসনিক বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৮৩টি উপজেলা এবং ৪,৪৯৮টি ইউনিয়নে বিভক্ত (বিবিএস-২০০৯)। প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি হিসাবে মোট ৪০,৪৮২টি ওয়ার্ড রয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা বিতরণের জন্য ওয়ার্ডগুলোকে ২৩,৫০০টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৩ জন। জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৩৯। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী প্রায় ৪৯ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ভূখন্ডে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি এবং তা ২০০ বছর পর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি হয়। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭ কোটি।

বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র

সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার
১৬৫০	১ কোটি	–
১৮৫০	২ কোটি	–
১৯৪১	৪ কোটি ১৯ লাখ	.৯১
১৯৬১	৫ কোটি ৪৫ লাখ	৩.১৫
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লাখ	৩.০০
১৯৯১	১০ কোটি ৮০ লাখ	২.১৭
২০০১	১২ কোটি ৯২ লাখ	১.৪৭
২০০৪	১৩ কোটি ৬৭ লাখ	১.৪৩
২০০৬	১৪ কোটি ৬ লাখ	১.৪১
২০০৯	১৪ কোটি ৬৬ লাখ	১.৩৯

সূত্র : বিবিএস-১৯৯৪, ২০০৩ ও ২০০৯

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বর্তমান লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার ১ অর্জন করা গেলেও ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ কোটি ২০ লাখে পৌঁছবে এবং ২০৬০ সালে ২১ কোটিতে গিয়ে স্থির হবে।

প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন আরও ১০ বছর বিলম্বিত হলে কম বয়সী জনসংখ্যা-কাঠামো থেকে সৃষ্ট গতিময়তার কারণে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছতে আরও ২৫ বছর লাগবে এবং তখন অর্থাৎ ২০৮৫ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে ২৫ কোটি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা ব্যুরো থেকে প্রকাশিত ২০১০ সালের জরিপ প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে। সামনের দিনগুলোতে এ হার আরও কমবে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার (১.৩৯) ও ২০১৫ সাল পর্যন্ত একই অস্থানে থাকবে। পরবর্তীকালে এ বৃদ্ধির হার কমতে থাকবে এবং ২০২৫ সালে এ হার কমে হবে ১.২ শতাংশ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার কারণে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ শীর্ষ দশটি জনবহুল দেশের তালিকা থেকে এক ধাপ পিছিয়ে অষ্টম স্থানে নেমে যাবে। তখন চীনকে পেছনে ফেলে ভারত হবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের দেশ। প্রজনন হার কমে যাওয়ার কারণে ভারতের চেয়ে কম জনসংখ্যা নিয়ে চীন দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী বর্তমানে শীর্ষ দশটি জনবহুল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার ৮৮৩ জন। ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থান যখন অষ্টম হবে তখন জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৯ কোটি ২৯ লাখ ৭৬ হাজার ৩২৮ জন। চলতি বছরের তালিকা অনুযায়ী চীনের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি–১৩২ কোটি ৩৬ লাখ প্রায়। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত–জনসংখ্যা ১১৫ কোটি ৬৯ লাখ প্রায় এবং তৃতীয় স্থানে যুক্তরাষ্ট্র–জনসংখ্যা ৩০ কোটি ৭২ লাখ প্রায়। জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমছে। এর মধ্যে প্রজনন হার ২০১৫ সালে হবে ২.৪ এবং ২০২৫ সালে হবে ২.১। বর্তমানে প্রজনন হার ২.৭।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

বিশ্ব প্রেক্ষাপট : প্রতিবছর এই বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ৮ কোটি। এই বাড়তি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতির ওপর বেশিমাত্রায় চাপ পড়ছে, বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণের মাত্রা যত বাড়ছে জলবায়ুর পরিবর্তনও ঘটছে সে মাত্রায়। এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বসবাসরত সকল প্রাণীর স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর জলবায়ুতে বিরাট পরিবর্তন ঘটছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধির ফলে যেমন মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে, তেমনি এর প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। যে কারণে বিশ্বের অনেক স্থানে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এসব দুর্যোগ এড়াতে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী দেশগুলোর বিশাল জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকার খোঁজে প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ পর্যায়েও জনসংখ্যা স্থানান্তরের ফলে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সঙ্কট প্রকট হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের সীমান্ত সংলগ্ন দেশগুলোতেও এর প্রভাবে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এর প্রভাব তীব্রতর হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ চাষাবাদযোগ্য জমি এ শতাব্দীর মধ্যেই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে বিশেষভাবে আশঙ্কা করছেন। বায়ুতে কার্বন

নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা গেলে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য থাকবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে ২০২০ সাল নাগাদ বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত অভিবাসন ঘটবে। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটবে। জলবায়ুর এসব পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও বেশি প্রভাব ফেলবে এবং এর বিস্তার ঘটবে ইউরোপে। কেননা, ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসায়িক ও আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মেরুঅঞ্চলে বিশেষ করে সুমেরু অঞ্চলে দ্রুত বরফ গলার কারণে নতুন জলপথ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হবে। পাশাপাশি মেরু অঞ্চলের বিপুল হাইড্রো-কার্বন সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হবে, যা এ অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত গতিপ্রকৃতি পাল্টে দেবে।

প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত

পরিকল্পিত জন্ম মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করে

পরিকল্পিত জন্ম মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করে। অল্প বয়সে, ঘনঘন এবং অধিক সংখ্যায় সন্তান ধারণ উচ্চহারে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর একটি বড় কারণ। বাংলাদেশে যেসব বিভাগে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেশি সেসব বিভাগে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কম। একইভাবে বিশ্বের যেসব দেশে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেশি সেসব দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হারও কম এবং যেসব দেশে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার কম সেসব দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু বেশি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমিই পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার অববাহিকা অঞ্চল। বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাবে।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উষ্ণতা ১ থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২০৫০ সালে ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির ফলে খরা এবং যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয় সেখানে বৃষ্টিপাত আরও বৃদ্ধি পাবে এবং যেখানে কম সেখানে এর পরিমাণ আরও কমে যাবে।

বর্ধিত জনসংখ্যার আবাসন সমস্যা নিরসনে প্রতি বছর ১.৫ থেকে ২.০ শতাংশ চাষযোগ্য ভূমি হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রভাবে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। উপরন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসলের ক্ষতিসাধন হবে এবং এর ফলে খাদ্য সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে শিক্ষা, বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সঙ্কট। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার রয়েছে সেসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

সূত্র : ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে 'সিটিজেন অ্যাম্বাসেডর টু দ্য ইউএন' এমডিজি বিষয়ক ভিডিও প্রতিযোগিতার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘ সদর দপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাপী এমজিডি বিষয়ক এক ভিডিও প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'সিটিজেন অ্যাম্বাসেডর টু দ্য ইউএন'। অনধিক ১৮ বছর বয়সী যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ উপলক্ষে ২১ জুলাই ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র চলচ্চিত্র ক্লাবের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের যুবকদের নিয়ে এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ওয়ার্কশপে বিভিন্ন যুব চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ফিল্ম সোসাইটির প্রতিযোগিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এতে এমডিজির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা এবং উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন তথ্য কেন্দ্রের মো. মনিরুজ্জামান। আয়োজিত অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি। ওয়ার্কশপে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন কার্যকর দিক তুলে ধরা হয়।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org